অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রথিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর ছবি। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, তাঁর ছবি দেখা ছাড়া কোনো পথ নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, তাঁর ছবি দেখা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের আর একটি পরিচয় নূতন আদর্শের প্রবর্তক রূপে। এদিক দিয়ে তাঁর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকারী এবং নবযুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি কোনো অংশে কম নয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার ঐতিহাসিক মূল্য তথ্যের দ্বারা বিচার করা সম্ভব। তথ্যের সাহায্যে বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু এই আলোচনার দ্বারা তাঁর প্রতিভার একটা মূল্য বিচার করা সম্ভব হবে। এবং তাঁর ছবি একটা ঐতিহাসিক পটভূমি পাবে, এই মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় তাঁর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪-৯৬)। তাঁর নিজের জীবনে এবং আধুনিক বারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি নূতন যুগের সূচনা করেছে। সে সময়ের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আমরা বুঝতে পারব।

একদিকে দিল্লী-কলম পাটনা-কলম ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত দেশী চিত্রের যে গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল তার সংস্কারগত শিক্ষার বাঁধাবাঁধি নিয়ম, কিছুটা কারিগর-সুলভ ওস্তাদি এবং দেশীয় চিত্রের আলংকারিক কাঠামো তখনও বজায় ছিল; উত্তুরে কাংড়া-কলম তথা রাজপুত ঢঙের কাজ অন্যান্য ধারার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সতেজ ছিল সত্য, কিন্তু সবসুদ্ধ এসময়ে ভারতীয় চিত্র অলংকারবহুল শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না। চিত্রের প্রাণ ও রসের দিক দিয়ে ভারতীয় চিত্র এসময়ে অতি দরিদ্র।

অন্য দিকে দেখি নবাগত য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ, বা য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ নামে তখন আমরা যে বস্তু গ্রহণ করেছিলাম, তার সাহায্যে য়ুরোপীয় রূপকলার প্রাণের সন্ধান আমরা পাইনি, পরিবর্তে পেয়েছিলাম বিলাতি শিল্পসংস্কার (technical convention), বস্তুরূপকে অনুকরণ করবার কৌশল; ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দেশী বিদেশি দুই ছবিতেই ছিল কৌশলের বিস্তার। আমাদের বিকৃত রুচির প্রতি লক্ষ করে হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন—

> Nowhere does art suffer more from charlatanism than in India... There is no respect for art in the millionaire who invests his surplus wealth in pictures and costliest furnuture so that his taste may be admmired or his wealth envied by his poor brethren[১]

অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রথম আমরা এমন এক রসবস্তুর প্রকাশ দেখি যে-রস সমকালীন কোনো চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তখনকার নব্য শিক্ষিত সমাজ কারিগরী কাজ দেখেই অভ্যস্ত। শিল্পবস্তু ও রসবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করবার শিক্ষাও ছিল না, এবং সে শিক্ষা পাবার সুযোগও ছিল না। এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি যখন সাধারণের সামনে প্রকাশিত হল, তখন বিদ্যার যাচাই করতেই একদল রসিক বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এতে অ্যানাটমি নেই, প্রক্ষিপ্ত ছায়া (cast shadow) পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নেই কেন? এইপ্রশ্নইপ্রধান হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও নূতন পদ্ধতিকে কি চোখে দেখেছিলেন একটা উদাহরণ দিই—

'ভারতীয় চিত্রকলার মূলসূত্র বোধ হয় এই যে, এমন বস্তু আঁকিবে বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনো সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে, অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায়, ভারতীয় চিত্রের নূতন পন্থীগনের চিত্র সৌন্দর্যকল্পনায় বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙুল ও হাত-পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। অ্যানাটমির বিরুদ্ধ হইলেই যেকোনো চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যোগ্য হয়। যে স্বাধীন কল্পনায় মানুষের হাত-পা যোজন বিস্তৃত আকারে পরিণত হয়, তাহা কল্পনার অভিধানের যোগ্য নয়। ভারতীয় চিত্রকলা অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানে কেন হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না।'[২]

চিত্র সমালোচনায় যুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্রূপ এবং রসের পরিবর্তে কৌশলের প্রতি মোহ নব্য শিক্ষিত-সমাজের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল।

আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজের কথাই তখন অকাট্য। শারীরস্থানের জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত, প্রক্ষিপ্ত ছায়া ছাড়া ছবি হতে পারে না— এই হুবহু নকল ও কাস্ট শ্যাডোর মোহ কেবল যে আমাদের শিক্ষিত সাধারণকেই অন্ধ করেছিল তা নয়। পণ্ডিত ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক— যাঁদের দেশীয় শিল্পের সঙ্গে দেশিয় মূর্তি শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁরাও এই কাস্ট শ্যাডোর মোহ কাটাতে পারেন নি; তারাও বোধহয় বিশ্বাস করতেন কাস্ট শ্যাডো-বর্জিত চিত্র হতে পারে না। এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ না হলে কি কোনো পণ্ডিত বলতে পারেন 'চীন দেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়ার সন্নিবেশের কোনো চেষ্টার কোনোও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া চিনা চিত্রকরদের শিক্ষাগুরু ভারতশিল্পীও যে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে?৩ কেবল শিক্ষার অভাবে নয়, ভুল শিক্ষায় আমাদের চিত্ত তখন বিভ্রান্ত।

দেশীয় রূপকলা সম্বন্ধে অজ্ঞতার বশে আমরা যে নিকৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অন্ধ অনুকরণ করছি, হ্যাভেলই প্রথম সেকথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। ইতিপুর্বে ভারতীয় ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্র নিয়ে দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু বারতীয় শিল্পের নন্দনীয়তা (aesthetic quality) সম্পর্কে কেউ ঝোঁক দেন নি। সাহস করে হ্যাভেলই প্রথম বলেছিলেন—

> It has been always my endeavour in the interpretation of Indian ideals to obtain a direct insight into the artist's meaning without relying on modern archaeological conclusions, and without searching for the clue which may be found in Indian Literature[৪]

অধ্যয়নবিমুখ দাম্ভিকের উক্তি বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হ্যাভেলকে বিদ্রূপ করেছিলেন। হ্যাভেলের এই মত অকাট্য নয় এবং ভারতীয় আদর্শ বোঝাতে তাঁকেও ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে সময়ে এই উক্তির প্রয়োজন ছিল। হ্যাভেল ছাড়া ডাক্তার কুমারস্বামী, উড্রফ্ সাহেব ও ভগিনী নোবেদিতার লেখার মধ্য দিয়ে ক্রমে ভারতীয় কলাসংস্যকৃতির প্রতি ধীরে ধীরে দৃষ্টি পড়ল। যখন হ্যাভেল ভারতিয় কলাসংস্কৃতির প্রবর্তনে যত্ন করছিলেন সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। হ্যাভেল অবনন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পী বলে প্রচার করলেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ভারতিয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত হচ্ছে, একথা পণ্ডিতরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না। শিল্পশাস্ত্র উদ্ধৃত করে কেবলই তাঁরা

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের চিত্রের অভারতিয়ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর অনুগামীদের কোনো ছবিই ভারতীয় আদর্শে তৈরি হচ্ছে না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রমত তাঁরা অনুসরণ করছেন না, প্রাচীন তাল-মান-প্রমাণাদির সঙ্গে তাঁদের ছবির বিসদৃশ-রকম প্রভেদ। তাঁদের মত যে খুব যুক্তিহীন ছিল তা নয়। কারণ, সত্যই অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীনের দলভুক্ত নন; কিন্তু আধুনিক যুগের ভারতীয় মনকে তিনি যে প্রকাশ করতে পেরেছেন, একথা তখন পণ্ডিতরা হয়তো লক্ষ করেন নি। কিন্তু এখন আমরা তা ভালো করেই বুঝতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হওয়ায় যদিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিরুদ্ধতা এসেছিল, অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল ভারতীয় চিত্রের নবজন্মদাতা হিসাবেই। হ্যাভেল বা কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের বা তাঁর সম্প্রদায়ের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে ঝোঁক দিয়েছিলেন তার ভারতীয়ত্বের উপর—

> The work of the Modern School of Indian Painters in Calcutta is aphase of the national reawakening. The subject chosen by the calcutta painters are taken from Indian History, romance and epic, and from the mythology and religious literature and legends, as well as from the life of the people around them. Their significance lies in their distinctive Indian-ness. They are however by no means free from European and Japanese influences. The work is full of refinement and subtlity in colour and of a deep love of all things Indian; but, contrasted with the Ajanta and Moghal and Rajput Paintings which have in part inspired it, it is frequently lacking in strength. The work should be considered as a promise rather than a fulfilment.[৫]

ভারতীয়ত্বের উপর ঝোঁক হ্যাভেলের কথায়ও আমরা পাই—

> If neither Mr. Tagore nor his pupils have yet altogether attained to the splendid technique of the old Indian painters, they have certainly revived the spirit of Indian art, and besides, as every true artist will, invested their work with a charm distinctively their own.For their work is an indication of that happy blending of Eastern and Western thought.[৬]

১৯১১ পর্যন্ত নব্য বাংলার চিত্রকলার যে রূপ, তার অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচয় এই দুই উক্তিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রাচীন ভারতীয়

আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করছেন বা করেছেন কিন্তু সেই আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে, একতা দুইজনের কারো উক্তিতেই পাই না। এই সময়ে দেশের মধ্যে যে জাতীয়তার আন্দোলন চলেছিল তারই অংশ বলে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী আর্টিস্ট, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা— কিন্তু যে ভারতীয় আদর্শের প্রতীকরূপে অবনীন্দ্রনাথকে তখন দেখা হচ্ছিল তাঁর ভক্তরা তখনও তার রূপকলার ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন নি। ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে ধারণাও তাঁদের অস্পষ্ট। ধর্ম দর্শন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল; এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যখনই তাঁরা আলোচনা করেছেন। দার্শনিক চিন্তা, সাহিত্যের রূপক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছবি বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা কি চোখে অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতেন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই—

'ভারতশিল্পে নবীন উদ্যমের নেতাগণ যে কেবলমাত্র শিল্পের জন্য শিল্পকার্য করিয়াই ক্ষান্ত তা নয়, হিন্দু জাতির প্রকৃতিগত যে আধ্যাত্মিকতা তাহারও বিকাশে ইহারা সকলে সচেষ্ট। সুতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তাপ্রবাহ, মহতী আশা ও দেশহিতৈষীতার সহিত ভারতশিল্পের এই নববিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ সুসংগত। ঠাকুরমশায়ের (অবনীন্দ্রনাথের) এই ছবিখানিতে (পুরীতে ঝড়, ১৯১১) আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আবাস। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। ফলতঃ যিনি এই প্রদর্শনীতে সূর্যালোক-উদ্ভাসিত দৃশ্যপট খুঁজিতে আসিবেন তিনি নিরাশ মনে ফিরিবেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ভারতবর্ষের যে বাহ্যিক রূপ দেখিতে পান, প্রাচ্যসৌন্দর্য-লিপ্সু ইউরোপীয় চিত্রকরগণ যে শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ আঁকিতে চেষ্টা করেন, এ স্থানে সে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা অন্তরঙ্গ ও বিষাদাচ্ছন্ন একটি অতিপ্রাকৃত ভারতবর্ষ। রূপকাত্মক অধ্যাত্মিক ধর্মপ্রাণ ও চিন্ময়।'[৭]

ছবিকে দার্শনিক বা কাব্যিক চিন্তা দিয়ে দেখবার এই চেষ্টা, এ দেশে বা বিদেশে, অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষীয়রা সকলেই করেছিলেন। ভারতীয় ছবি ভাবাত্মক কাজেই আধ্যাত্মিক, এই বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক ভাব ও দার্শনিক চিন্তা ছবিতে খোঁজবার চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টারই ফলে আজ অধিকাংশের কাছে আধুনিক ভারতীয় ছবি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, এখনও এই মোহ সম্পূর্ণ কাটে নি। যাঁরা এই জাতীয় ব্যাখ্যা সে সময় দিয়েছিলেন তাঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে ভাবের আধিক্য এমনই হয়েছিল যে, আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে ভাবের আধিক্য এমনই হয়েছিল যে, ছবি যে দেখবার

জিনিস সে কথা আমরা প্রায় ভুলেছিলাম। আমাদের প্রাচীন বারতিয় শিল্পাদর্শের পুনরুদ্ধারকার্য চলেছে অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের হাতে, এইতেই সকলে খুশি। নূতন ছবিতে খুব বড় রকমের গভীর ভাব ভারতীয় চিন্ময় রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, একথা তখন বেশ ভালোরূপেই আমাদের মনে গেঁথেছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন ভাব ও ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকাতেই কবির ভাব ামাদের অন্তরে প্রবেশ করে, ছবির ক্ষেত্রেও যে তেমনি ভাব-প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা দরকার—সেকথা তখন কেউ মনে করতে পারেন নি। রূপের রেখার বর্ণের ঝংকারে ভাব যুক্ত হলে তাকেই আমরা বলি ছবি। ছবির ভাষাকে চেনবার ঔৎসুক্য তখনও জাগে নি। এ দিক দিয়ে কোনো চেষ্টাও হয় নি। কেবল আদর্শকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু ভারতীয় আদর্শ যেমনই হোক, রূপকলার ক্ষেত্রে সে আদর্শের প্রয়োগ ও প্রকাশ যে কি ভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা হত তাঁরা যদি জানতেন—

> The evolution of Indian Art is organised by the rythm which organises the work of art, and nothing is left to chance, and little to extraneous influences... Its movements are strictly regulated. In no other civilisation, therefore, we find such minute prescriptions for proportious and movements. The relation of the limbs, every bend and every turning of the figures represented, are of the deepest significance. This dogmatism, far from being sterile, conveys regulations how to be artistically tactful, so that no overstrain, no inadequate expression, and no weakness ever will become apparent. The regulations are a code of manners.[৮]

এতক্ষণ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠেছিল তারই পরিচয় দিলাম। এইবার এই তর্কজাল অতিক্রম করে তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করলে কি আমরা পাই, দেখবার চেষ্টা করব এবং তাঁর সম্বন্ধে মতামতের বা মূল্য কতটা, তাও যাচাই করতে পারব।

২

দেশে বিদেশে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয চিত্রের পুনরুদ্ধার করেছেন বলে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কোনোদিন কোনো কিছু চেষ্টা করে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। অলংকারশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন 'ষড়ঙ্গ' লিখেছিলেন এবং 'ভারতশিল্প' গ্রন্থে ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে ওকালতিও করেছিলেন, কিন্তু ছবি রচনার কালে সে মত তিনি অনুসরণ করেন নি। সংক্ষেপে, ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা

থাকলেও, ভারতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যের ভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নি।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের ১৩১৬ সালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই থেকে তাঁর সে সময়ের মনোভাব পরিষ্কার দেখা যায়—

আমি দেখিয়াছি তোমরা কোনো একটা সুন্দর দৃশ্য লিখিতে হইলে বাগানে কিম্বা নদীতীরে গিয়া গাছপালা ফলফুল জীবজন্তু দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে থাক। এই সহজ ফাঁদে সৌন্দর্যকে ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তোমরা কি জাননা সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নয়, কিন্তু অণতরের? অন্তর আগে কবি কালিদাসের মেঘদুতের রস-বরষায় সিক্ত কর তবে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও, নব মেঘদুতের নূতন ছন্দ উপভোগ করিবে; আগে মহাকবি বাল্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমুদ্রের চিত্রলিখন।[৯]

অবনীন্দ্রনাথের এই উপদেশের উদ্দেশ্য কি? তিনি চেয়েছিলেন কল্পনার বা ভাবের জগতে ছাত্রদের মনকে নিয়ে যেতে, কিন্তু সেই ভাব কি ভাবে কোন্ উপায়ে তারা প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। বস্তুর বাইরের রূপটাই সব, তার অনুকরণই আর্ট, এই ধারণার বিপরীত মত দেখা দিল। বস্তুরূপটা কিছুই নয়, ভাবপ্রকাশের জন্য অনুকরণের কোনোই প্রয়োজন নেই— এই মতকে চরম নন্দনাদর্শ (aesthetic ideal) বলা যেতে পারে। এই মত ব্যক্তিগত; জাতিগত আদর্শ একে বলা চলে না। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে, অবনীনদরনাথ কোনো দেশ বা কালের আদর্শ অনুসরণ করেন নি, নিজের রুচির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, বুদ্ধি দ্বারা সে আদর্শকে তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি সে আদর্শ গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয়—

'ভারতশিল্পের বায়ু দেবতার মূর্তি— তাও আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মতোই ছেলেমানুষি পুতুলমাত্র। একই মূর্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই। দেবমূর্তিগুলো তেত্রিশকোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গিতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য। একই দেবীমূর্তি, মকরে চড়া হলেই হলেন গঙ্গা, কচ্ছপে বসে হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপকল্পনার মধ্যে যে রকম বাবনার ও মহিমার পার্থক্য,গ্রীকমূর্তি আপোলো ভিনাস জুপিটার জুনো ইত্যাদির মূর্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্তিকে একটু আসবাব রংচং আসন বাহন বদলে রকম-রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর

কেউ বায়ুকে সুন্দর করে পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এ মূর্তির একটা ছাঁচ আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি— গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্যসাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে— ছবি দেখে বুঝবে না, মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো। [১০]

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এই মত, কাজেই এই মতের মূল্য অস্বীকার করা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিবার পরিণতিতেও এই মতের কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ দেশী ও বিদেশী চিত্রের আলংকারিক রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪) তারই প্রকাশ আমরা দেখি। কিন্তু দেশী ছবির আলংকারিক কাঠামো বিশুদ্ধ রইল না। তার বিলাতী অঙ্কনবিদ্যার প্রভাবে ক্রমে এমন একটা রূপ পেল তাঁর ছবি যা হুবহু বিলাতী মিনিয়েচার (miniature) নয়, দেসী আলংকারিক পটও নয়— কিন্তু নতুন কালের নতুন ছবি, যে ছবি সে সময় ছিল না কোথাও। দেশী বা বিদেশী ছবির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থায় ছিল, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্বপ্রধান দান এই। আধুনিক যুগের উপযোগী রূপকলার ভাষা আমাদের দিলেন; সে ভাষা যতই অর্বাচীন হোক, তবু সেই ভাষার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করবার সুযোগ পেলাম আমরা।

১৮৯৪-৯৬ সালে যখন অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী রচনা করছিলেন তখন তিনি অখ্যাত। ১৮৯৭ সালে ই.বি. হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অবনীন্দ্রনাথ সাধারণের সামনে এলেন। ভারতীয় আদর্শের নবজন্মদাতা বলে হ্যাভেল তাঁকে পরিচিত করলেন। দেশের লোক তাঁর ছবিতে 'অস্বাভাবিকত্ব', প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, লম্বা হাত-পা দেখে কিরকম মর্মাহত হয়েছিলেন সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। হ্যাভেলের সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ মোগল-চিত্র বিচারবিশ্লেষণ করে দেখলেন। মোগল চিত্রকরদের আশ্চর্য অঙ্কনকৌশল ও সূদ কারুকার্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর নিজের কথায়— 'ছবিতে বাব দিতে হবে'। এই 'ভাব' কথাটির অর্থ তখন তিনি কি বুঝেছিলেন তা কোথাও লেখার ভাষায় প্রকাশ করেন নি। কিন্তু ছবিতে একটি পরিবর্তন দেখতে পাই যার প্রকাশ 'ভারতমাতা' (১৯০২) চিত্রে এবং যার পরিণতি 'ওমর-খৈয়াম' (১৯১৮) চিত্রাবলীতে। প্রথমেই দেখি, তাঁর প্রথম দিকের ছবির আলংকারিক বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে। ছবিতে পটভূমির সমতলতা নষ্ট হয়ে দূরত্ব (স্দ্মথত্বত্র ত্মত্রদ্মষ্ঠ্চ দেখা দিয়েছে। ছবিতে এই পরিবর্তন মোগল ও জাপানী চিত্রের সংস্পর্শে হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাতী (academic

school) অঙ্কন পদ্ধতির প্রভাবও যে ছিল আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্মরণ রাখি না। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর টেকনিকের উপকরণ পেয়েছিলেন মোগল জাপানী এবং য়ুরোপীয় শিল্পসংস্কৃতি থেকে। য়ুরোপীয় ও জাপানী শিল্প-সংস্কৃতির প্রদান গুণ ছিল বাস্তবিক (naturalistic) প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে, সেই পদ্ধতির ছবিতে চটকদারিটাই সব। মোগল দরবারী পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক (realistic) যাতে রূপের বাহার খোলে গুণের যোগ-বিয়োগে। অবনীন্দ্রনাথের টেকনিক যে স্বাভাবিক এ কথা এখন স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর ছবির স্বাভাবিকতা বিলাতী অ্যাকাডেমির মত নয়, জাপানীর মত নয়, মোগলের মতও নয়। এ স্বাভাবিকতা তাঁর নিজের। আরও বিচার করলে এই বলা চলে যে মোগলচিত্রের আলংকারিক রূপ, তার সূক্ষ্ম কারুকার্য, আরও একটু স্ত্রখত্রুরে স্বাভাবিক করে তিনি দেখালেন। কিন্তু যে উপায়ে তিনি দেখালেন সেটা কোনো বিশেষ রীতি নয়— একান্তভাবে তাঁর নিজের তৈরি, নিজস্ব ভাব প্রকাশের জন্য। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কনরীতির প্রবর্তক নন, তিনি স্টাইলের স্রষ্টা। অবনীন্দ্রনাথের ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাঁর স্টাইল, উপেক্ষিত রয়ে গেছে দুই কারণে। প্রথম ও প্রধান কারণ, কেবলই তাঁকে ভারতীয় দার্সনিক ও আধ্যাত্মিক কোঠায ঠেলে দেবার চেষ্টা; দ্বিতীয় কারণ, অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি এবং তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে যে সময়ে তখন তাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি আশা ছিল ভারতীয় শিল্পী হিসাবেই— এইজন্য তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে নি; প্রাচীনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কতটা মোগলের কাছে পৌঁছেছেন সেইটাই দেখবার চেষ্টা হয়েছিল। এইজন্যই তাঁর স্টাইল উপেক্ষা করে তাঁর ভাবের কথাই সকলে বলেছেন।

কোনো দিক দিয়েই অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় চিত্রকরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর নিজস্ব অঙ্কনভঙ্গী স্টাইলের আলোচনায় আরও পরিষ্কার হল। তাঁর আত্মতন্ত্র ও একান্ত নন্দনাদর্শ, তাঁর রূপ-উপাসক (রূপানুকারী নয়,) দৃষ্টিভঙ্গী, তবার আঁকবার স্টাইল, সব নিয়ে তাঁকে প্রাচীনের সগোত্র বলা চলে না। তিনি আধুনিক কালের অসামান্য প্রতিভাবান চিত্রকর— এ রকম প্রতিভা দীর্ঘকাল ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা দেয়নি। তবে কি ভারতীয় শিল্পাদর্শ আজও পুনরুজ্জীবিত হয় নি? অবনীন্দ্রনাথ কি ভারতিয় চিত্রের নুতন যুগের প্রবর্তক নন? এই প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাভাবে দেবার দরকার নেই, তাঁর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাব।

বিশুদ্ধ প্রাচীন দেশী আর্ট অবনীন্দ্রনাথ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতায় চিত্রকলায় আধুনিক রূপ দিলেন বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণের দ্বারা। বিদেশী সংস্কৃতিকে যেভাবে তিনি নিজের করতে পেরেছেন সমগ্র এশিয়ায় তার তুলনা কম। যাঁরা

এইভাবে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম এবং কোনো-কোনো দিক দিয়ে অদ্বিতীয়। জাপানে চীনে প্রাচীন পদ্ধতির বড় বড় ওস্তাদ আছেন, বিলাতীর অনুকারক আছেন, কিন্তু গ্রহণ করে নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষমতা দৈবাৎ চোখে পড়ে। স্বদেশীযুগের গোঁড়া মনোভাবের কাছে অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ হয়তো রুচিকর হত না, কিন্তু আজকের আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অপরের থেকে গ্রহণ করবার সাহস দিয়েছেন। তারপর, ভারতীয় পুরাতন কলাসংস্কৃতির প্রতি যে দৃষ্টি ফিরেছে সেজন্য হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর কাছে আমরা ঋণী, এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবও অনেকখানি।

কিন্তু উড়িষ্যার পূর্বপ্রথাগত খোদাই করা মূর্তি বা পাটনা-কলমের ছবি নিয়ে আধুনিক মনকে সরস রাখা সম্ভব ছিল না। ইংরেজের আর্ট কেবল তর্ক দিয়েও দূর করা যেত না যদি অবনীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ না হত। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমরা আধুনিক হয়েছি। আধুনিক হয়ে আমরা প্রাচীনকে দেখেছি, প্রাচীনকে অনুসরণ করে আধুনিক হই নি। তারপর, যখন ইংলন্ড এবং য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র ছবির নামে কেবল বিদ্যার বাহাদুরী এবং ধূপছায়ার (shade and Light-এর) ছড়াছড়ি চলেছে সেই সময় এই অনুকৃতির (naturalism-এর) মোহ কাটিয়ে রস সৃষ্টির আদর্শকে দেখতে পাওয়ার মূল্য অনেকখানি। তাই আর একবার বলতে হয়, অবনীন্দ্রনাথের প্রাচীন শিল্পাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার আন্দোলন নয়, তাঁর সাধনার দ্বারা শিল্পবোধের রসবোধের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। এই দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি।

৩

এইবার ভাবের দিক দিয়ে বা রসের দিক দিয়ে কতটুকু বলে প্রকাশ করা যেতে পারে দেখা যাক। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী প্রভাব রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথের রসবোধের উন্মেষ এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্য এবং চিত্র এই দুই ধারায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভা এমনভাবে এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছে যে কোন্‌টি তাঁর প্রধান ক্ষেত্র বলা শক্ত। সাহিত্যের অনুভূতি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি এই দুইয়ের মিশ্রণে এবং দুইয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় আমাদের গল্প শুনিয়েছেন। ভাষার বেগে আমাদের মন এগিয়ে চলে; শুধু কথা শোনার সুখ; শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবি— ভালো করে দেখতে যাও কি ছবি ফুটে উঠল, ভাষার দমকে আর উপমার ঝংকারে সবকিছু মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ আসে আর-একটা ছবি। ভাষা, অলংকার, ক্রমে ছবি, তাও মিলিয়ে

আসে— মনের মধ্যে বাজতে থাকে শব্দের ঝংকার; আবার মনে পড়ে যায় ভাষা, অলংকার, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির টুকরো। তাঁর রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, বুড়ো আংলা— ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি। আর, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ছবি কিরকম তার উত্তরে বলতে পারি— বর্ণের ঝংকারে ফুটে ওঠা রূপ। সাহিত্যে যেমন তাঁর শব্দের ঝংকার, ছবিতে তেমনি তাঁর বর্ণের ঝংকার আমাদের আকৃষ্ট করে। ছবিতে রঙের জগৎ পেরিয়ে একটুখানি রূপের আভাস আমরা পাই, কিন্তু বর্ণের আবরণের অন্তরাল থেকেই রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। একেবারে সামনে এসে দৈবাৎ অবনীন্দ্রনাথের রূপের জগৎ আমাদের দেখা দেয়। তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীতে এই রূপের জগৎ যত কাছে আমাদের আসে, অন্য কোথাও দৈবাৎ এমন করে তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। অধিকাংশ স্থলেই একটু সুর একটু ইঙ্গিত দিয়েই তাঁর রূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায়। এত মৃদু সেই ইঙ্গিত, এত ক্ষণিকের যে চিত্রকরের নিজেরই সন্দেহ জাগে, সব সুর কানে পৌঁছবে কি না, সব ইঙ্গিতের অর্থ আমরা বুঝব কি না। তাই আগে থেকে বলে রাখার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের নামের প্রবর্তন এবং এইজন্যেই অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে নামের এত মূল্য দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা আর তাঁর ছবিরচনা, এই দুয়েরই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভঙ্গী— দেখাবার জন্য দেখানো, বলবার জন্যই বলা। বলবার জিনিসটা যেমনই হোক, বলে তিনি কিছু বোঝাতে চান নি। দেখিয়ে তিনি কিছু চেনাতে চান নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে ছবিতে যা করতে চেয়েছেন তা তাঁরই কাছ থেকে আমরা শুনে নিতে পারি—

'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তার ছবি হলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।'

অবনীন্দ্রনাথের ছবি সত্যই রূপকথা— রঙের সুরে, রূপের ইঙ্গিতে, তা ব্যক্ত হয়েছে।